ইসলামই
একমাত্র
সমাধান

বই	ইসলামই একমাত্র সমাধান
মূল	মুহাম্মাদ কুতুব رحمه الله
অনুবাদক	ইফতেখার সিফাত
প্রকাশক	রফিকুল ইসলাম

ইসলামই একমাত্র সমাধান

মুহাম্মাদ কুতুব رحمه الله

RUHAMA
PUBLICATION
রুহামা পাবলিকেশন

ইসলামই একমাত্র সমাধান

মুহাম্মাদ কুতুব ﵀

গ্রন্থস্বত্ব © রুহামা পাবলিকেশন

প্রথম প্রকাশ
রবিউল আওয়াল ১৪৪৫ হিজরি / সেপ্টেম্বর ২০২৩ ইসায়ি

অনলাইন পরিবেশক
ruhamashop.com
rokomari.com
wafilife.com

মূল্য : টাকা

RUHAMA
PUBLICATION

রুহামা পাবলিকেশন
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, মাদরাসা মার্কেট (২য় তলা),
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮ ০১৭৫১০৮২০০৮
ruhamapublication1@gmail.com
www.fb.com/ruhamapublicationBD
www.ruhamapublication.com

بسم الله الرحمن الرحيم

অনুবাদকের কথা

মুসলিম-জাতি দীর্ঘকাল যাবৎ ইসলামি শরিয়াহর শাসন থেকে বঞ্চিত। শরিয়াহর ছায়াতলে জীবনযাপনের যেই স্বাদ ও তৃপ্তি, আমাদের কয়েক প্রজন্ম তা আস্বাদন না করেই কবরস্থ হয়ে গেছে। কালের পরিক্রমায় ইসলামি শাসনব্যবস্থার সৌন্দর্য আজ মুসলিম প্রজন্মের কাছে চির অচেনা, অপরিচিত এক বিষয়ে পরিণত হয়ে গেছে। একদিকে তারা ইসলামি শরিয়াহর ছায়াতলে জীবনযাপনের হাজারো ন্যায়নিষ্ঠতার প্রবাদতুল্য দৃষ্টান্তকে রূপকথার গল্পের মতো মনে করছে—অন্যদিকে আধুনিক বিশ্বব্যবস্থার পরিবেশে ইসলামি শরিয়াহর শাসনকে তারা প্রায় অসম্ভব বলে বিশ্বাস করে নিচ্ছে।

এর ফলে তারা প্রথমত ইসলামি শরিয়াহর শাসনব্যবস্থাকে মনেপ্রাণে কামনা করতে পারছে না। দ্বিতীয়ত আধুনিক সমাজব্যবস্থার সংকট নিরসনে ইসলামের পরিবর্তে জাহিলি নানান তন্ত্র-মন্ত্রকে সমাধান হিসেবে বেছে নিচ্ছে। ফলে তারা কোনো সমাধানে তো পৌঁছতেই পারছে না; বরং সংকটের অতল গভীরে গিয়ে পতিত হচ্ছে। পশ্চিমা জাহিলি মতবাদ তাদেরকে আল্লাহর দাসত্ব থেকে সরিয়ে কিছু মানুষের দাসে পরিণত করছে, তাদের জীবনযাত্রাকে করে তুলছে আরও দুর্বিষহ। আর এটাই তো হওয়ার ছিল। কারণ, তারা ভুল পথে হেঁটেছে। প্রকৃত সমাধানকে গ্রহণ করে নেয়নি।

বর্তমান মুসলিম প্রজন্মকে বুঝতে হবে—

এক. বিশ্বমঞ্চে বিদ্যমান সকল ধরনের সংকটের একমাত্র সমাধান হলো ইসলাম।

দুই. ইতিহাসের সোনালি অধ্যায়ে ইসলামি শাসনব্যবস্থার ন্যায়নীতি ও নৈতিকতার যেই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমরা দেখি, তা আজও জমিনে বাস্তবায়ন করা সম্ভব। সেই ঝলক আজও পৃথিবীর আকাশে উদয় ঘটানো সম্ভব। তা কাল্পনিক কিছু নয়।

তিন. শরিয়াহর ছায়াতলে জীবনযাপন করা মুসলিমদের জন্য ঐচ্ছিক কোনো বিষয় নয়। এটি তাদের ওপর আবশ্যকীয় বিষয়। তাদের জন্য বৈধ নয় ইসলামি শরিয়াহর শাসনকে পরিত্যাগ করে অন্য কোনো শাসনব্যবস্থাকে গ্রহণ করে নেওয়া এবং সেটাকে প্রতিষ্ঠা করা।

মুসলিমদের ভেতর যেন উল্লেখিত বোধ তৈরি হয়, তাদের ভেতর যেন ইসলামি শাসনব্যবস্থার বাস্তবিক আগ্রহ ও প্রচেষ্টা পয়দা হয়—সেই উদ্দেশ্যেই আমাদের ক্ষুদ্র প্রয়াস 'ইসলামই একমাত্র সমাধান' নামক অনূদিত বইটি। মূল বইটির নাম 'হাজা হুওয়াল ইসলাম', লিখেছেন আরবের প্রখ্যাত মুফাক্কির মুহাম্মাদ কুতুব ﵀। বইটিতে তিনি বর্তমান সময়ে ইসলামি শরিয়াহর আবশ্যকীয়তা ও প্রাসঙ্গিকতা এবং ইসলামের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও বিচারিক ব্যবস্থার ন্যায়নিষ্ঠ কিছু মূলনীতি ও বাস্তব দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন। যাতে মুসলিমদের ভেতর ইসলামি শরিয়াহর বাস্তবিক কামনা ও প্রয়োজনীয়তাবোধ জন্ম নেয়। মহান আল্লাহ তাআলা মহৎ এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে বইটিকে সফল করুন এবং সংশ্লিষ্ট সকলের প্রচেষ্টাকে কবুল করে নিন। আমিন।

ইফতেখার সিফাত

সূচিপত্র

ভূমিকা ⁞ ০৯

স্থির ও পরিবর্তনশীল যুগ ⁞ ১৩

ইসলামে রাজনৈতিক ন্যায়নীতি ⁞ ৩৫

ইসলামে অর্থনৈতিক ন্যায়নীতি ⁞ ৫৩

ইসলামে সামাজিক ন্যায়নীতি ⁞ ৬৫

নারী-পুরুষের সম্পর্কের মাঝে ন্যায়নীতি ⁞ ৭৭

আল্লাহর দ্বীনে অপরাধ ও শাস্তির বিধান ⁞ ৮৯

এটাই হলো ইসলাম! ⁞ ১০৩

ভূমিকা

মুসলিম দায়িরা যখন বলেন, 'ইসলামই একমাত্র সমাধান', তখন বহু মানুষ এতে সন্দেহ করে!

এ ক্ষেত্রে সেক্যুলার ও তাদের অনুসারীদের অবস্থান স্পষ্ট। তারা ইসলামকে সংস্কার ও সংশোধনের পথ হিসেবে দেখতেই অপছন্দ করে। তাই কেউ এমন দাবি করুক তারা তা সহ্য করতে পারে না। কেননা, তাদের দৃষ্টিতে ধর্মকে পার্থিব কোনো বিষয়ে টেনে আনা সঠিক নয়; বরং ধর্ম শুধু বান্দা ও রবের মাঝে মনের সম্পর্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে, বাস্তব জীবনে যার কোনো কাজ নেই; বরং ধর্মকে দুনিয়ার কোনো বিষয়ে প্রবেশ করানো মহাপাপ। এর থেকেই সকল সমস্যার উৎপত্তি হয়।

এদের অবস্থান যেমন স্পষ্ট, তেমনই কারণও স্পষ্ট। তারা শুরু থেকেই পশ্চিমাদের সবকিছু মেনে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কারণ, তাদের দৃষ্টিতে পাশ্চাত্যই হলো সভ্যতা, উন্নতি ও অনুকরণীয় আদর্শ। আর সেই পশ্চিমারা বলে, ধর্ম ছিল (তাদের ইতিহাসে) অন্ধকারাচ্ছন্নতা ও পিছিয়ে থাকার মূল কারণ। পশ্চিমারা ততদিন উন্নত ও সভ্য হতে পারেনি, যতদিন না তারা ধর্মকে ছুড়ে ফেলেছে বা অন্তত ছোটো গণ্ডিতে আবদ্ধ করেছে, যে সীমা ধর্মের অতিক্রম করা উচিত নয়। ফলে ধর্ম এখন (ব্যক্তির ইচ্ছা অনুযায়ী) বান্দা ও রবের মাঝে ব্যক্তিগত সম্পর্কের বিষয়ে পরিণত হয়েছে, যার স্থান শুধুই অন্তর। বাস্তব জীবনের সাথে যার কোনো সম্পর্ক নেই।

এদের নিয়ে আমরা এই বইয়ে কোনো আলোচনা করব না। কেননা, তাদের সাথে আলোচনা করেও কোনো ফায়দা নেই। আমরা শুধু তাদের জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে হিদায়াতের দুআ করতে পারি। যেন তারা আল্লাহ-প্রদত্ত চোখে সত্য দেখে সত্যের পথে ফিরে আসে, অন্যের চোখে দেখে হিদায়াত থেকে বিচ্যুত না হয়।

বরং আমরা এই বইয়ে আলোচনা করব সেসব ব্যক্তির সাথে, যারা ইসলামের শত্রু নয় বা ইসলামকে জমিনে প্রতিষ্ঠিত দেখতে অপছন্দ করে না; কিন্তু তারা মনের গহিনে সন্দেহ পোষণ করে, ইসলাম কি আসলেই আধুনিক জীবনের সব সমস্যা সমাধান করতে পারবে?! যেগুলো অনেক জটিল এবং প্রতিনিয়ত এর জটিলতা বেড়েই চলেছে। তারা ভাবে, প্রথম যুগে যদিও ইসলাম দুনিয়ার সমস্ত সমস্যা সমাধান করে মানুষের জীবনকে সর্বোচ্চ স্তরে উঠিয়ে আনতে পেরেছিল; কিন্তু সে যুগের সাথে

বর্তমানের এমন এক দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে, যেখানে থেকে এটা কল্পনাও করা যায় না যে, ইসলাম বর্তমানের সমস্যাও সে যুগের মতো সফলভাবে সমাধান করতে পারবে বা ইসলাম আধুনিক জীবনের জটিল সব সমস্যা সমাধানের জন্য উপযুক্ত!

এসব ব্যক্তির ব্যাপারে যদিও ধরে নিই যে, তাদের নিয়ত ভালো এবং তারা ইসলামের প্রতি ঘৃণা ও শত্রুতা রাখে না—তবে তাদের সন্দেহের কারণ হলো, (চাই তারা বলুক বা গোপন রাখুক) তারা ইসলামকে মুসলিম উম্মাহর শেষ প্রজন্মগুলোর হাতে যেভাবে বিকৃত অবস্থায় পেয়েছে, সেই দৃষ্টিতেই দেখে। তাই তারা মনে করে, ইসলাম এই অবস্থায় বর্তমান যুগের সমস্যা সমাধানে অক্ষম। কারণ, তাদের ধারণামতে আধুনিক যুগ এত বিশাল, যার সমস্যার সমাধান ইসলামের আয়ত্তের বাইরে; তাই আমরা যদি ইসলামকে রক্ষা করতে চাই, তাহলে আমাদের উচিত এদিক-সেদিক থেকে বহু কিছু যুক্ত করা; যাতে তা প্রথমে বর্তমান যুগকে আয়ত্তে নিতে পারে—অতঃপর না হয় সমাধানের চেষ্টা করা যাবে।

আমরা বহুবার বলেছি, আমরা যে ইসলামকে বলছি, এটাই হলো একমাত্র সমাধান, তা সেই ইসলাম, যেভাবে আল্লাহ তাআলা কুরআনে নাজিল করেছেন এবং সুন্নাতে রাসুল ﷺ-এ বর্ণিত হয়েছে। সেই বিকৃত রূপ নয়, যা শেষ যুগে এসে পালিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা যেভাবে ইসলাম নাজিল করেছেন, তা উম্মাহর ওপর প্রমাণস্বরূপ। উম্মাহর কোনো প্রজন্মই ইসলামের ওপর প্রমাণ নয়, বিশেষ করে সর্বশেষ প্রজন্মগুলো, যারা ধীরে ধীরে সত্যিকার ইসলাম থেকে বিচ্যুত হয়ে একসময় তা থেকে বের হওয়ার উপক্রম হয়েছে; অথচ তারা এখনো নিজেদের মুসলিম ধারণা করছে।

ইসলামের বাস্তব রূপ হিসেবে আমরা যে সময়কে মাপকাঠি হিসেবে গণ্য করতে পারি, তা ইসলামের সূচনা-যুগ। রাসুলুল্লাহ ﷺ ও খুলাফায়ে রাশিদিনের যুগ। যে যুগে ইসলামের সকল আদর্শ, মূল্যবোধ ও মূলনীতি পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হয়েছে। তাই আমরা যখন আল্লাহ তাআলার নাজিলকৃত রূপে ইসলামের ব্যাপারে আলোচনা করি, তখন আমরা এমন কোনো দৃষ্টান্তের ব্যাপারে কথা বলি না, যা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়; বরং তা সত্যিই একসময় বাস্তবায়িত হয়েছে, যা মানুষরাই করেছে। যারা কোনো ফেরেশতা বা অন্য কোনো প্রাণী ছিল না। তারা তাদের পূর্ণ মনুষ্যত্ব দিয়েই তা বাস্তবায়ন করেছে। যে মানুষের মধ্যে রয়েছে শক্তি ও দুর্বলতা। যারা মর্যাদার আসনে উঠতে পারে আবার অধঃপতিত হতে পারে। বরং আমরা শুধু রাসুলুল্লাহ ﷺ ও খুলাফাদের যুগেই সীমাবদ্ধ থাকিনি। পরবর্তী উত্তম সময়গুলোও গণ্য করি, যাদের ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

خَيْرُكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ

> 'তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম যুগ হলো আমার যুগ, অতঃপর যারা আসবে তারা, এরপর যারা আসবে তারা।'[১]

এটা সত্য যে, বর্তমান মানুষের জীবনের অনেক কিছু ইসলামের শুরু সময়ের প্রথম প্রজন্মের জীবন থেকে অনেক ভিন্ন হয়ে গেছে; কিন্তু এখানে একটি মৌলিক বিষয় রয়েছে। তা হলো, কোন যুগকে মাপকাঠি ধরা হবে? সেই যুগের স্থির অবস্থা দ্বারা কি বর্তমান পরিবর্তনশীল যুগের ওপর ফায়সালা দেওয়া হবে, না পরিবর্তনীয় অবস্থা দ্বারা স্থির যুগের আদর্শ পরিবর্তন করা হবে? বাস্তবে কোন বিষয়টি পরিবর্তন হবে—মূল বস্তু নাকি বাহ্যিক রূপ?

আশ্চর্যজনক বিষয় হচ্ছে, কিছু মানুষ বলে, ইসলাম আধুনিক জীবনের সমস্যার সমাধানে সক্ষম নয়; কেননা, ইসলামে মানুষের বাহ্যিক নয়, অভ্যন্তরীণ পবিত্রতাও শর্ত—যা অনেক কঠিন কাজ। অন্যদিকে গণতন্ত্রে এমন কোনো শর্ত নেই। তাই সৎ-অসৎ সবাই তা বাস্তবায়ন করতে পারে। ফলে সেটা মানুষের সমস্যা সমাধানে অধিক উপযুক্ত।

আরও আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, অনেকে বলে, ইসলাম দুনিয়ার সমস্যার সমাধানের উপযুক্ত নয়। কেননা, ইসলাম মানুষের আধ্যাত্মিকতার ওপর নির্ভর করে, যার ওপর অন্য কারও নিয়ন্ত্রণ থাকে না (অর্থাৎ কেউ আসলেই ভালো নাকি মন্দ, তা বোঝার ক্ষমতা সে নিজে ছাড়া অন্য কারও নেই)। অন্যদিকে গণতন্ত্র বিভিন্ন পরিচালনা-প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কাজ করে। তাই তা অন্ধভাবে কারও আধ্যাত্মিকতার ওপর নির্ভর থেকে বেশি কার্যকরী। কেমন যেন মুসলিমদের জীবনে কোনো সংগঠন ছিল না! কেমন যেন মুসলিমদের আহলে হল ও আকদ, আদালত-বিচারালয়, বাইতুল মাল ইত্যাদি কোনো সংস্থা ছিল না! যেন সবই ছিল শূন্যে উড়ে বেড়ানো আধ্যাত্মিক পাখি।

এ কিতাবে আমাদের উদ্দেশ্য এটা নয় যে, আমরা বর্তমান মানুষের জীবনের সকল সমস্যার বিস্তারিত সমাধান পেশ করব। কেননা, এ কাজটি কোনো একক ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়; বরং তা সব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বহু ফকিহ ও গবেষক মিলে করবেন। যারা কিতাব ও সুন্নাহ থেকে আধুনিক সময়ের সকল বিধিবিধান বের করে বাস্তবায়ন করবেন। তাই আমরা শুধু মূল মূল চিন্তা ও মূলনীতিগুলোর দিকে ইঙ্গিত করব।

---

১. সহিহুল বুখারি, হাদিস নং ২৬৫১; সহিহু মুসলিম, হাদিস নং ২৫৩৫।

এখানে আমরা ইসলামের রাজনৈতিক ইনসাফ, ইসলামের অর্থনৈতিক ন্যায়নীতি, ইসলামের সামাজিক ইনসাফ, ইসলামে পুরুষ ও নারীর মাঝে ইনসাফ, অপরাধ ও শাস্তির ক্ষেত্রে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ও অন্যান্য বিষয়ের সংক্ষিপ্ত কিছু মৌলিক চিত্র নিয়ে আলোচনা করব।

আমরা এখানে দুটি বিষয়ের দিকে আহ্বান করব।

আমরা উম্মাহকে গাফিলতি থেকে জেগে ওঠার আহ্বান করি; যাতে তারা সত্যিকারের দৃঢ় সংকল্প করে আল্লাহর দিকে ফিরে আসে। কেননা, সত্যিকার অর্থে আল্লাহর দিকে ফিরে আসা ব্যতীত তাদের সমস্যা সমাধানের কোনো পথ নেই।

আমরা তাদের আহ্বান করি, যেন তারা নতুন করে সঠিক দ্বীনের পরিচয় লাভ করে। তখন তারা এখান থেকে তাদের জীবনের সব বিষয়কে কুরআন ও সুন্নাহমতে ইনসাফের সাথে পরিচালিত করার পাথেয় পেয়ে যাবে। তারা এই বিশ্বাস করবে যে, আল্লাহ তাআলার বাণী একমাত্র সত্য। তিনি কিতাবে যা বলেছেন, সব সত্য। তাই আল্লাহ যা বলেছেন, তা দুনিয়া ও আখিরাতে মুক্তির একমাত্র পথ।

আল্লাহর অনুগ্রহে ধীরে ধীরে উম্মাহর মাঝে কাঙ্ক্ষিত এ বুঝ ও সচেতনতা অর্জিত হচ্ছে, যার নিদর্শন স্পষ্ট। কারণ, আল্লাহ তাআলা এই দ্বীনকে গোমরাহিতে এমনভাবে ছেড়ে দেন না যে, উম্মাহ তাঁর অনুগ্রহ থেকে বের হয়ে যাবে; বরং তারা যখনই গাফিল হয়ে যায়, তখনই তিনি এমন ব্যক্তিদের পাঠান, যারা এই দ্বীনকে নবায়ন করে।

বর্তমানের অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে (আল্লাহর ওপর মন্তব্য করছি না), (সচেতন মুসলিমদের পাশাপাশি) এই দায়িত্ব এখন উম্মাহর শত্রুদের কাঁধে অর্পিত হয়েছে। শত্রুরা আজ তাদের (বোকামির ফলে) উম্মাহকে জাগ্রত করে তুলছে এবং দ্বীনকে নতুনভাবে জানা ও মানার দিকে ধাবিত করার কাজ করছে। এই ধারা অব্যাহত থাকলে আল্লাহর ইচ্ছায় শীঘ্রই এই উম্মাহর নবজন্ম হবে এবং পুরো দুনিয়াকে ইনসাফ দ্বারা পূর্ণ করবে, যেভাবে তা পূর্বে জুলুমে পূর্ণ হয়ে ছিল। যে বাণী সত্য নবি ﷺ বলে গেছেন।

মুহাম্মাদ কুতুব

স্থির ও পরিবর্তনশীল যুগ

কিছু মানুষ সংশয় পোষণ করে যে, চোদ্দোশ বছর পূর্বে যে শরিয়ত নাজিল হয়েছে, তা কীভাবে সেই সময় থেকে পরিপূর্ণ ভিন্ন আধুনিক যুগে প্রয়োগ হবে! কীভাবে আজ আমাদের জীবনকে শাসন করবে; অথচ বর্তমান অবস্থা ও পরিস্থিতি এতটাই পালটে গেছে যে, এ যুগের সাথে শরিয়ত নাজিলের যুগের কোনো সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া দুষ্কর!

যদি আমরা মেনে নিই যে, এই শরিয়ত সেই যুগের জন্য এক বিশাল পরিবর্তন ছিল। এটি মানুষকে জাহিলিয়াতের অন্ধকার জীবন থেকে এমন উত্তম আদর্শ, বিশ্বাস ও শাসনের দিকে বের করে এনেছে, যা তখন কারও কল্পনাতেও আসেনি। মানুষকে ভ্রষ্টতার গিরিখাত থেকে তুলে এনে এতটাই উঁচুতে উঠিয়েছে, যা ছিল সে যুগের প্রতিষ্ঠিত পরিবেশ, শাসন ও সংস্কৃতি থেকে অনেক ঊর্ধ্বে। এসব মেনে নেওয়া সত্ত্বেও প্রশ্ন থেকে যায়, আজকের বিশ্বে উন্নতি ও সভ্যতার পথে এত বিশাল অগ্রগতির পরেও কি এই শরিয়াহর গুরুত্ব ও মর্যাদা অবশিষ্ট আছে? চোদ্দোশ বছর পূর্বে জাজিরাতুল আরবের মানুষের জন্য যেমন উপযুক্ত ছিল, তা কি আধুনিক সমাজের মানুষের জন্যও সে রকম উপযুক্ত?

বহু মানুষের মনে এই সংশয় থাকায় আমরা বক্ষ্যমাণ বইয়ে দুটো বিষয়ের মাধ্যমে এর বাস্তবতা স্পষ্ট করব। আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিলকৃত ওহির মাধ্যমে এবং ইতিহাসের ধারায় মানুষের পরিবর্তনের ধাপের মাধ্যমে।

ওহি থেকে : যারা উপরিউক্ত সন্দেহ পোষণ করে, তারা ভুলে যায় যে, আল্লাহ তাআলা এই দ্বীনকে শুধুই জাজিরাতুল আরবের জন্য নাজিল করেননি; যদিও আরবকে দাওয়াতের উৎস হিসেবে বাছাই করেছেন, (আর আল্লাহ তাআলা তাঁর রিসালাত কোথায় পাঠাবেন, তা তিনিই ভালো জানেন।) তবে তা পুরো মানবজাতির জন্য পাঠিয়েছেন। একেবারে শুরুর দিন থেকে, মুমিনরা যখন দুর্বল ও সংখ্যায় স্বল্প ছিল, এই দাওয়াহ তার সূচনালগ্নে বহু বাধা ও চাপের শিকার হচ্ছিল। তখনই আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাঁর রাসুল ﷺ-এর ওপর নাজিলকৃত ওহি এই দাওয়াতের বৈশ্বিকতার ঘোষণা দিয়ে বলেছে, মুহাম্মাদ ﷺ-কে সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রেরণ করা হয়েছে—

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ

'এটা তো কেবল বিশ্ববাসীর জন্য এক উপদেশ।'[২]

وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ

'অথচ তা (কুরআন) বিশ্বজগতের জন্য এক মহান উপদেশ বৈ অন্য কিছু নয়।'[৩]

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ

'আমি তো আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য পাঠিয়েছি।'[৪]

قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا

'বলুন, "হে মানবজাতি, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহর রাসুল।"'[৫]

এ সবই মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত। সবগুলো আয়াত জমিনে দাওয়াতের স্থিরতা ও মদিনায় ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্বে নাজিল হয়েছে।

এই সংশয়গ্রস্ত ব্যক্তিরা আরও ভুলে যায় যে, আল্লাহ তাআলা এই দ্বীনকে দুনিয়া যতদিন টিকে থাকবে, ততদিন পর্যন্ত মানুষের জীবনপরিচালনার জন্য নাজিল করেছেন। তিনি কোনো সময় নির্দিষ্ট করে দেননি যে, এরপর মানুষ এই দ্বীন মানতে বাধ্য থাকবে না; বরং আল্লাহ তাআলা দুটো বিষয় বলেছেন, যা স্পষ্ট কিছু বিষয় প্রমাণ করে :

প্রথমত, এই দ্বীনের পূর্ণতা—

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করলাম, তোমাদের জন্য

---

২. সুরা আত-তাকবির, আয়াত নং ২৭।
৩. সুরা আল-কলাম, আয়াত নং ৫২।
৪. সুরা সাবা, আয়াত নং ২৮।
৫. সুরা আল-আরাফ, আয়াত নং ১৫৮।

> আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং দ্বীন হিসেবে ইসলামকে তোমাদের জন্য পছন্দ করলাম।'[৬]

দ্বিতীয়ত, নবুওয়াতের সমাপ্তি—

> مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ
> اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

> 'মুহাম্মাদ তোমাদের পুরুষদের কারও পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসুল ও শেষ নবি। আল্লাহ সবকিছুই ভালোভাবে জানেন।'[৭]

সুতরাং এই দ্বীন পূর্ণাঙ্গ, যেখানে কিছুই বৃদ্ধি বা সংযুক্ত করা যাবে না। নবুওয়াত সমাপ্ত; তাই মুহাম্মাদ ﷺ-এর পর কোনো নবি আসবেন না। অর্থাৎ আল্লাহর নিকট এই দ্বীন কিয়ামত পর্যন্ত এই রূপে নির্ধারিত হয়ে গেছে।

উক্ত সংশয়গ্রস্ত ব্যক্তিরা (অনিচ্ছায় অজ্ঞতায়) আল্লাহ তাআলার দুটো সিফাত অস্বীকার করে—তাঁর সর্বজ্ঞানী ও মহা প্রজ্ঞাময় হওয়া। তাদের কথা দ্বারা মনে হয়, কেমন যেন আল্লাহ তাআলা এই দ্বীন নাজিলের সময় মানবজাতির মধ্যে ভবিষ্যতে ঘটবে এমন পরিবর্তনের ব্যাপারে জানতেন না! কেমন যেন আল্লাহ তাআলা এতটা প্রজ্ঞাময় ছিলেন না যে, মানুষকে এমন কিছু বিধান দিয়েছেন, যা কিছু দিন পর অনুপযুক্ত হয়ে যাবে! অথচ আল্লাহ তাআলা কিতাবে নিজেকে মহা প্রজ্ঞাময় হিসেবে গুণান্বিত করেছেন এবং মুমিনরা তা বিশ্বাস করে।

আল্লাহ তাআলা-প্রদত্ত ওহির দিক থেকে এই বিষয়টা স্পষ্ট।

এখন মানুষের অবস্থা থেকে বিষয়টা বোঝার জন্য কিছু ব্যাখ্যার প্রয়োজন।

এই বিশ্বে মানবজীবন শুরুর পর থেকে আজ পর্যন্ত মানুষের ইতিহাসে বহু পরিবর্তন হয়েছে। ফলে বাহ্যদৃষ্টিতে মনে হয় সবকিছুই পরিবর্তন হয়ে গেছে। কেমন যেন পূর্বের মানুষের সাথে বর্তমানের মানুষের কোনো মিলই নেই।

কিন্তু গভীরভাবে লক্ষ করলে স্পষ্ট হয়, এসব বিশাল পরিবর্তন সবই মানুষের জীবনের শুধু বাহ্যিক রূপে ঘটেছে। এগুলো কোনোটাই মানুষের মূলবস্তুতে ঘটেনি, যা তার অভ্যন্তর থেকে তাকে পরিচালিত করে এবং তার জীবনের পথ বাতলে দেয়।

---

৬. সুরা আল-মায়িদা, আয়াত নং ৩।
৭. সুরা আল-আহজাব, আয়াত নং ৪০।

সূচনাকাল থেকে মানুষের মাঝে দুই ধরনের অন্তর রয়েছে। দুটোই একে অপর থেকে ভিন্ন অনুভূতি লালন করে এবং পরস্পর ভিন্ন পথে চলে—

> وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ
> مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ - لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ
> يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ
> - إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ
> الظَّالِمِينَ
>
> ‘ওদেরকে আদমের দুই পুত্রের (হাবিল ও কাবিল) ঘটনা ঠিকঠিকভাবে শোনান; যখন তারা (আল্লাহর উদ্দেশ্যে) একটি করে কুরবানি করেছিল। তাদের একজনের কুরবানি কবুল হলো, অন্যজনের হলো না। তখন দ্বিতীয়জন (প্রথমজনকে) বলল, “আমি তোমাকে খুন করে ফেলব।” প্রথমজন বলল, “আল্লাহ তো কেবল মুত্তাকিদের কুরবানি কবুল করেন। তুমি যদি আমাকে হত্যা করার জন্য আমার দিকে তোমার হাত বাড়াও, আমি তোমাকে হত্যা করার জন্য তোমার দিকে আমার হাত বাড়াব না; (কারণ) আমি তো সারা জাহানের রব আল্লাহকে ভয় করি। আমি চাই, তুমি আমার ও তোমার (দুজনেরই) পাপ মাথায় নিয়ে জাহান্নামের অধিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হও। আর সেটাই জালিমদের শাস্তি।”’[৮]

মানুষের অন্তরের এই দ্বিমুখিতা কি পূর্বের থেকে বর্তমানের মানুষের মাঝে কোনো পরিবর্তন হয়েছে? জমিনে মানব সূচনাকাল থেকে এখানে কি কোনো পরিবর্তন ঘটেছে?

আজও কি মানুষ অতীতের মতোই খারাপ প্রবৃত্তির চাহিদায় অন্যের ওপর না-হক বাড়াবাড়ি করে না? আজও কি অনেক ব্যক্তি, দল ও রাষ্ট্র লোভ বা হিংসা অথবা ক্ষমতার আগ্রহে বা অন্যের সম্পদ দখলের ইচ্ছায় অন্যের ওপর জুলুম করে না?

তাহলে পূর্বের যুগ থেকে বর্তমানের কী পরিবর্তন হয়েছে?

পূর্বের যুগে মানুষ এক টুকরো কাপড় বা চামড়া দিয়ে নিজেকে ঢেকে রাখত। ফলে তখন শয়তান এসে তাদের উলঙ্গ হতে প্ররোচিত করত। অতঃপর মানুষ সুন্দর রং-

---

[৮] সুরা আল-মায়িদা, আয়াত নং ২৭-২৯।

বেরংয়ের কাপড় বানানো শুরু করে। তখনও শয়তান এসে বিভিন্ন সময় ও স্থানে তাদের কাপড় খোলার কুমন্ত্রণা দেয়। ফলে একই অপরাধ ঘটে, যা পূর্বেও ঘটেছে—

يَابَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا
لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا
جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

> ‘হে আদম-সন্তানেরা, শয়তান যেন তোমাদের ফিতনায় না ফেলে, যেভাবে সে তোমাদের পিতামাতাকে নিজেদের লজ্জাস্থান দেখানোর মতলবে বিবস্ত্র করে জান্নাত থেকে বের করেছিল। সে ও তার দলবল তোমাদের দেখতে পায়; যেখান থেকে তোমরা তাদের দেখতে পাও না। যাদের ইমান নেই, আমি শয়তানদের তাদের বন্ধু করে দিয়েছি।’[৯]

তাহলে পূর্বের যুগ থেকে বর্তমানের কী পরিবর্তন হয়েছে?

আমরা শয়তানের ধোঁকার কথা বাদ দিই; বরং স্বয়ং মানুষ নিয়ে কথা বলি।

মানুষ একসময় গুহায় বসবাস করত। ইতিহাসের সেই যুগের বহু স্মৃতি আজও বিভিন্ন গুহার দেয়ালে অঙ্কিত রয়েছে। অতঃপর মানুষ একটু উন্নত হয়ে বাঁশ বা ইট-পাথর দিয়ে ঘর বানিয়েছে, অথবা তাঁবু খাটিয়েছে; যাতে রোদ-বৃষ্টি থেকে রক্ষা পেতে পারে। অতঃপর আরও উন্নত হয়ে সুরম্য অট্টালিকা-প্রাসাদ ও আকাশছোঁয়া টাওয়ার তৈরি করেছে। শোয়ার ঘরকে পানি, বিদ্যুৎ ও অন্যসব উপকরণ দ্বারা সজ্জিত করেছে।

তাহলে পূর্বের যুগ থেকে বর্তমানের কী পরিবর্তন হয়েছে, মানুষের মৌলিক বসবাসের ইচ্ছা, নাকি বসবাসের ইচ্ছা বাস্তবায়নের বাহ্যিক চিত্র?

এককালে মানুষ খাবারের জন্য শিকার ও গাছের ফলের ওপর নির্ভর করত। আগুন আবিষ্কারের পূর্বে তারা কাঁচা খাবারই খেত। অতঃপর কৃষি আবিষ্কারের পর বিভিন্ন উদ্ভিদ রোপণ করে তা থেকে খাবার তৈরি করত। অতঃপর উন্নত খাবার তৈরিকে একটি শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে যায়। এই শিল্পের জন্য কাঁটা-চামচ, ছুরি ইত্যাদি উপকরণ বানায়। এমনকি খাবারের সময় করণীয় বহু রীতিনীতি বানায়। কিন্তু পরিবর্তন হয়েছে কোনটা?——খাবারের চাহিদা, না চাহিদা বাস্তবায়নের চিত্র?

---

৯. সুরা আল-আরাফ, আয়াত নং ২৭।

মানুষ তাদের শত্রুর (পশু ও মানুষের) সাথে যুদ্ধের জন্য সাধারণ সব উপকরণ ব্যবহার করত। যা দ্বারা হত্যা বা আহত বা শত্রুকে বিতাড়িত করত। অতঃপর একটু উন্নত হয়ে বর্শা ও তরবারির মতো ধারালো অস্ত্র ব্যবহার শুরু করে। অতঃপর আরও উন্নত হয়ে ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্র বানায়। যেমন : পারমাণবিক বোমা, বিষাক্ত গ্যাস-বোমা, কামান ও ক্ষেপণাস্ত্রের মাধ্যমে দূর থেকে গণহত্যা চালানো। কিন্তু কী পরিবর্তন হয়েছে? যুদ্ধের আগ্রহ, নাকি যুদ্ধের ইচ্ছা বাস্তবায়নের উপকরণ?

তা ছাড়া স্বয়ং যুদ্ধের ইচ্ছার পেছনে কারণ ছিল হয়তো নিজের প্রতিরক্ষা বা অপরের ওপর আঘাত। এই মূল ইচ্ছায় কি কোনো পরিবর্তন হয়েছে? না ইতিহাসে সর্বযুগে এটা একই ছিল, শুধু উপকরণ পরিবর্তন হয়েছে? এটা ঠিক যে, উপকরণে আরও নতুন কিছু যুক্ত হয়েছে। যেমন : রাজনৈতিক চাপ বা অর্থনৈতিক চাপ দেওয়া বা শিক্ষার্জনে বাধা দেওয়া ইত্যাদি। কিন্তু ইতিহাসের কোনো যুগেই কি যুদ্ধের মূল প্রেরণা পালটিয়েছে?

মানুষ একসময় পায়ে হেঁটে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত করত। অতঃপর কিছু জন্তুকে পোষ মানিয়ে তা বহন ও আরোহণের জন্য ব্যবহার করেছে। অতঃপর উন্নত হয়ে একসময় গাড়ি, বিমান ইত্যাদি আবিষ্কার করেই যাচ্ছে। কিন্তু কী পরিবর্তন হয়েছে? যাতায়াতের ইচ্ছা, নাকি মাধ্যম ও উপকরণ? এ ছাড়া এসব যাতায়াতের বাহন কি আকাশ থেকে পড়েছে, না তারা নিজ ইচ্ছায় কল্পনা করে করে বানিয়েছে?

এভাবে আমরা যদি মানুষের জীবনে ঘটা সকল পরিবর্তন নিয়ে ভাবি, তাহলে এই বাস্তবতা সর্বক্ষেত্রে স্পষ্ট হবে—মূলবস্তু ছিল স্থির, তবে বাহ্যিক রূপ পরিবর্তন হয়েছে।

এটা সত্য যে, বাহ্যিক রূপের পরিবর্তনের ফলে মানুষের আচরণেও সদা পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু এখানে একটি প্রশ্নের পূর্ণ গুরুত্বের সাথে জবাব দেওয়া আবশ্যক। যখন বাহ্যিক চিত্র পরিবর্তন হয় এবং এর সাথে আচরণেও পরিবর্তন আসে, তখন কি এই পরিবর্তিত আচরণ এমন কোনো নতুন কাজ বা দায়িত্ব জন্ম দেয়, যা মানুষ পূর্বের আচরণের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করত না? না মূল কাজ একই রয়ে যায়, শুধু ধরনের মধ্যে পরিবর্তন আসে?

এটাই এই আলোচনার মূল বিষয়, যার ওপর ভিত্তি করে পুরো চিত্রটি স্পষ্ট হয়।

যখন মানুষের জীবন-পরিচালনার জন্য কোনো আইন প্রণয়ন করা হয়, তখন কি উদ্দেশ্য এমন থাকে যে, এর মাধ্যমে মানুষের জীবনের অপরিবর্তনীয় বিষয়গুলোর

সমাধান দেওয়া হবে? না ধারাবাহিক পরিবর্তনশীল বিষয়গুলো সমাধানের উদ্দেশ্য থাকে? না একসাথে দুটো উদ্দেশ্য থাকে? যদি একসাথে দুটো উদ্দেশ্যই থাকে, তাহলে অপরিবর্তনীয় বিষয়কে কতটুকু গুরুত্ব দেবে এবং পরিবর্তনীয় বিষয়কে কতটুকু গুরুত্ব দেবে? অন্য ভাষায় বলা যায়, মানুষের জীবনের স্থির ও পরিবর্তনশীল বিষয়গুলোর সাথে কীরূপ আচরণ হবে?

ইসলাম—যা আল্লাহ-প্রদত্ত দ্বীন এবং মানুষের স্বভাবজাত ধর্ম—এটা এই বিষয়ের জন্য চূড়ান্ত নীতিমালা প্রণয়ন করে দিয়েছে। তা হলো,

মানুষের ফিতরাতের অপরিবর্তনীয় বিষয়কে ইসলাম সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে। কেননা, এটাই জীবনের মূল ভিত্তি। তাই সেসবের জন্য অপরিবর্তনশীল ও বিস্তারিত নীতিমালা নাজিল করে কোনোরূপ পরিবর্তন ছাড়া সেগুলো মান্য করার আদেশ দেওয়া হয়েছে।

তবে পরিবর্তনশীল বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে মুমিনদের জন্য নিজ বুদ্ধি দ্বারা উপযুক্ত আইন গবেষণা করে বের করার সুযোগ রাখা হয়েছে। তবে কিছু শর্ত রয়েছে, যা নতুন গবেষণালব্ধ মাসয়ালাকে স্থির বিষয়গুলোর সাথে সংযুক্ত রাখবে। তা হলো, কোনো হালালকে হারাম করা বা হারামকে হালাল করা যাবে না এবং সেগুলো শরিয়তের মাকসাদের বিরোধী হতে পারবে না। এসব শর্ত মান্য করে গবেষণা চালিয়ে গেলে কোনো মুমিনের সামনে জীবনে স্থির ও পরিবর্তনীয় বিষয়ে আর কোনো সমস্যা বাকি থাকবে না। সে কখনোই স্থির বিষয়কে পরিবর্তন অথবা স্থির ও পরিবর্তনের বিষয়ের মাঝে সম্পর্ক ছিন্ন করার প্রয়োজন অনুভব করবে না।

এখানে বিস্তারিত বলার সুযোগ নেই, আমরা উদাহরণত কয়েকটা বিষয় বাছাই করেছি।

প্রথম দৃষ্টান্ত

ইসলামে সবচেয়ে মৌলিক অপরিবর্তনীয় বিষয় হচ্ছে, কোনো প্রকার অংশীদার ছাড়া একমাত্র আল্লাহ তাআলার ইবাদত করা। ইসলাম একে কঠিনভাবে প্রমাণ করেছে এবং মানুষের জীবনের সকল কিছুর মূল উৎস বানিয়েছে।

এখানে অনেক হিকমত রয়েছে। আল্লাহ তাআলা হচ্ছেন সর্বজ্ঞানী ও মহা প্রজ্ঞাময়। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে শুধু প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় নাজিল হয়। আল্লাহ তাআলা যে রাতে কুরআনুল কারিম দুনিয়ায় নাজিল করেছেন, সেই রাতের প্রশংসা করে বলেছেন,

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ - فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ

> ‘আমি একে (কুরআন) নাজিল করেছি এক বরকতময় রাতে (শবে কদরে)। নিশ্চয়ই আমি সতর্ককারী। এ রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় নিরূপিত হয়।’[১০]

আল্লাহর নাজিলকৃত কিতাবে এই দ্বীনকে চিরন্তন এক বাস্তবতার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। তা হলো, তাওহিদ বা কোনো অংশীদারহীন এক আল্লাহ তাআলার একত্ববাদ। তেমনই মানুষের ব্যাপারটাও একটি চূড়ান্ত বাস্তবতার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। তা হলো, মানুষের সৃষ্টির গঠনে আনুগত্যের স্বভাব বা উবুদিয়্যাহর ফিতরাত। এই স্বভাব আল্লাহ তাআলা মানুষের মাঝে দিয়েছেন; যেন সে তার রবের পরিচয় লাভ করে তাঁর ইবাদত করে—

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا

> ‘(স্মরণ করুন) যখন আপনার পালনকর্তা আদম-সন্তানদের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাদের বংশধরদের বের করে এনেছিলেন এবং তাদের থেকে তাদের নিজেদের ব্যাপারে সাক্ষ্য নিয়েছিলেন, “আমি কি তোমাদের রব নই?” তখন তারা বলেছিল, “হ্যাঁ, আমরা সাক্ষ্য দিলাম।”’[১১]

এ দুই বাস্তবতার দাবি হচ্ছে, মানুষ অংশীদারহীন রবের ইবাদত করবে। কেননা, উলুহিয়্যাহ, রুবুবিয়্যাহ ও আসমা-সিফাতে একত্ববাদের ফলে একমাত্র তিনি ইবাদতের উপযুক্ত।

কিন্তু আল্লাহ তাআলা মানুষকে আসমান-জমিনের অন্যসব বস্তুর মতো ইবাদতে বাধ্য করেননি; বরং তার মাঝে নিজস্ব বুঝ-বুদ্ধি, ইচ্ছা ও স্বাধীনতা দিয়েছেন; বরং তাকে চিন্তা-ভাবনা করে আশ্বস্ত হয়ে বুঝে-শুনে ইবাদতের দায়িত্ব দিয়েছেন।

এখানে মানুষ দুদলে ভাগ হয়ে গেছে।

এক দলের ফিতরাত বা স্বভাব-প্রকৃতি সত্যের ওপর স্থির হয়েছে। ফলে তারা চিন্তা-গবেষণা করেছে এবং চিন্তা-ভাবনার জন্য আল্লাহ তাআলা-প্রদত্ত মাধ্যম শ্রবণ, দৃষ্টি ও অন্তরকে ব্যবহার করে দৃঢ় বিশ্বাস করেছে যে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য

---

১০. সুরা আদ-দুখান, আয়াত নং ৩-৪।
১১. সুরা আল-আরাফ, আয়াত নং ১৭২।